

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূলের সিরাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার

রোলঃ 23090121599

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূলের সিরাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার

রোলঃ 23090121599

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ রাসূলের সিরাত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা আক্তার, আইডিঃ 23090121599 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ জোবায়ের হাসান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রাসূলের সিরাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদিজা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

খাদিজা আক্তার

আইডিঃ 23090121599

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কেন পড়বো সিরাত?

জাহেলিয়াতের অন্ধকার -

- তৎকালীন আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিস্থিতি
- আলোর অপেক্ষায়

আঁধারের বুক চিড়ে প্রভাতের আলো -

- রাসূলের বংশধারা
- জন্ম ও নামকরণ

সুরভিত শৈশব

- হালিমা (রা:) এর কোলে
- মা এবং দাদার প্রস্থান
- চাচার স্নেহে বড় হওয়া

তারুণ্যের উজ্জ্বল চরিত্র -

- হিলফুল ফুযুল গঠন

পরিণয় -

- খাদিজা (রা:) এর সঙ্গে বিবাহবন্ধন
- সন্তানাদি
- নবীজির কন্যা এবং স্ত্রীগণ
- আল - আমীন হিসেবে পরিচিতি :কাবাঘর পুনঃনির্মাণ

হেরা গুহায় আলোকবার্তা -

- ওহীর সূচনা
- নবুয়তপ্রাপ্তি

অবিশ্বাসের ঝড় এবং ধৈর্যের শাসমুদ্র -

- দাওয়াতের সূচনা
- প্রলোভন এবং অত্যাচার
- হত্যার পরিকল্পনা
- আবিসিনিয়ায় হিজরত
- চাচার ইত্তিকাল

মিরাজের রাত-

- আকাশের সিঁড়ি বেয়ে অনন্তের পথে

রক্তমাখা পথে দোয়ার ঝর্ণাধারা

- আত তাইফ

মদীনার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ -

- মদিনায় হিজরত
- সাওর গুহায় অবস্থান
- মসজিদে নববি নির্মাণ
- গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র

- আনসার ও মুহাজিরদের মিলন
- আযানের সূচনা

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ -

- মদিনা সনদ
- কিবলা পরিবর্তন

বদরের যুদ্ধ -

- গায়েবি সাহায্য
- শিক্ষা

উহ্দের ক্ষত এবং ধৈর্যের শিক্ষা

খন্দকের প্রাচীরে আকাশ ছোঁয়া ঈমান

হুদাইবিয়ার সন্ধি: পরাজয়ে ঢাকা জয়

কিছু উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ -

- খাইবারের যুদ্ধ
- মুতার যুদ্ধ
- হুনাইন যুদ্ধ
- তায়েফ যুদ্ধ
- তাবুক যুদ্ধ

মক্কা বিজয়: ঘরে ফেরার মুহূর্ত এবং ক্ষমার মিছিল

বিদায় হজ: মানবতার অঙ্গীকার

নবীজির ইন্তেকাল : অনন্তের পথে যাত্রা

সিরাহ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা

সিরাহ শব্দটি এসেছে (সারা - ইয়াসিরু) ধাতু থেকে যার অর্থ চলা বা গমন করা। সিরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। সিরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি জীবনভর হেঁটে চলে। সিরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনী বুঝায় না বরং তা যেকোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বুঝায়।

তবে মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনীর সাথে সিরাহ শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সিরাহ বলতে অধিকাংশ সময় উনার জীবনীকেই বুঝানো হয়।

সিরাহ পড়া একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয়। কারণ এর মাধ্যমে আমরা শুধু ইতিহাসই জানি না, বরং জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা পাই।

সিরাহ অধ্যয়ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক:

১) নবীজির জীবনের অনুসরণ: কুরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে,

“তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব ৩৩:২১)

সিরাহ না পড়লে তাঁর আদর্শকে কিভাবে জানব আমরা? মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাক। সিরাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে আরোও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

২) কুরআন বুঝা সহজ হয়: অনেক আয়াত নবীজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। সিরাহ পড়লে সেই প্রেক্ষাপট পরিষ্কার হয়।

৩) ঈমান বৃদ্ধি পায়: নবীজির ত্যাগ, ধৈর্য, সাহস, দয়া ও আল্লাহর উপর ভরসা জানলে আমাদের অন্তরে ঈমান আরোও দৃঢ় হয়।

৪) নৈতিক শিক্ষা: সিরাহ থেকে আমরা নানাবিধ নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারি যেমন: সত্যবাদিতা, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়বিচার, ধৈর্য ইত্যাদি।

৫) দাওয়াত কৌশল শেখা যায়: নবীজী (সাঃ) যেভাবে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, ধাপে ধাপে সংগ্রাম করেছেন তা দাওয়াতের কাজেও পথপ্রদর্শক।

৬)কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করার অনুপ্রেরণা:নবীজী ও সাহাবীরা যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন আর ঐ সময় উনারা যেভাবে ধৈর্য্য ধারণ করেছেন তা জেনে আমরা নিজেদের জীবনের কষ্টকে সহজ মনে করতে পারি।

৭) সিরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত: সিরাহ বিনোদনের জন্য নয় ,এটি একটি ইবাদাত। সিরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তায়ালা তার তরফ থেকে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

যে জামায়াতে রাসূল (সাঃ) এর সিরাহ অধ্যয়ন করা হয়,সে জমায়েত আল্লাহ তায়ালা ইবাদাত করার জামায়েত।

৮)একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত্র: সিরাহ শুধু ধর্মীয় নয়,রাজনৈতিক,সামাজিক,পারিবারিক ,সামরিক সব দিকের শিক্ষা দেয়।

জাহেলিয়াতের অন্ধকার:

- তৎকালীন আরবের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

সামাজিক অবস্থা :

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন ববসাব করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পরিবারে পুরুষ এবং মহিলাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা এবং ন্যায়-ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু ব্যাপারে মহিলাদের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাঁদের যুক্তি-সঙ্গত কথাবার্তার যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো এবং তাঁদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দেয়া হতো। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। মহিলাদের মান মর্যাদার ব্যাপারে হানিকর বা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে খুন-খারাবি শুরু হয়ে যেত।

প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রধান সমাজ কাঠামোই আরবে প্রচলিত ছিল। পরিবার প্রধান বা পরিবারের পরিচালক হিসেবে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হতো। পারিবারিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী এবং সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো। বর-কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে কনের

অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। অভিভাবকগণের অগোচরে ইচ্ছামাফিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার মহিলাদের ছিল না।

এক দিকে যখন সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারসমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এ ব্যবস্থা, অপরপক্ষে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা এবং জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যাকে অশ্লীলতা, পাশবিকতা এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না। উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তথ্যাদি সূত্রে জানা যায় যে, অন্ধকারে যুগে আরব সমাজে বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তো সেই প্রথা যা বর্তমান যুগেও জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথানুসারে বিভিন্ন দিক বিবেচনার পর একজন তাঁর অধীনস্থ মহিলার জন্য অন্য এক জনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে ধার্য মোহর দিয়ে বিয়ে করত।

নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো ‘নিকাহে ইসতিবযা’। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিদর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিব্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে ‘নিয়োগ’ বলা হয়।

তথাকথিত ‘বিবাহ’ নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘন্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহবানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন

তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, ‘আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।’

তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন ‘হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে আপনারই সন্তান।’ মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

নারী-পুরুষের ‘বিবাহ ও মিলন’ নাম দিয়ে আরও একটি জঘন্য রকমের অশ্লীল রেওয়াজ জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে কোন মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এরা হচ্ছেন পতিতা প্রবৃত্তির পেশাবলম্বিনী মহিলা। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তাঁরা আপত্তি করতেন না। এদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পেশার প্রতীক হিসেবে নিশান দিয়ে রাখা হতো যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নির্দিষ্ট গমনাগমন করতে পারেন। যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভ ধারণের পর যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহবান জানানো হতো। সেই ব্যক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণান্তে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানপির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, ‘এ সন্তান আপনার’। যাকে লক্ষ্য করে এ রায় দেয়া হতো তিনি তা মানতে বাধ্য থাকতেন। এভাবে নব জাতকটির একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেত। তিনিও শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

যখন আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন তখন জাহেলিয়াত যুগের সর্ব প্রকার অশ্লীল বৈবাহিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে রাসূলে কারিম (সাঃ) আরব সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করেন।

জাহেলিয়াত আমলে একই সঙ্গে একাধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। একই সঙ্গে দু’সহোদরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সংসার করাটা কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এবং পিতা কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা বিমাতাকে বিবাহ প্রথাও তৎকালে চালু ছিল।

স্ত্রীকে পুরুষদের তালাক প্রদানের অধিকার ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা ছিল না অতঃপর ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়।

সেই আমলে ব্যভিচারের মতো একটি অতি ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হতে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষকেই দেখা যেত। কোন গোষ্ঠী কিংবা গোত্রের খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এ নারকীয় দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থাকত। অবশ্য এমন কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষও চোখে পড়ত যাঁদের আভিজাত্যানুভূতি ও সম্ভ্রম বোধ পাপাচারের এ পঙ্কিলতা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখত। অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে নারীদের জীবন যাপন করতে হতো। অবশ্য দাসীদের তুলনায় স্বাধীনাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল।

সমাজে দাসীগণকে অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হতো। তৎকালীন সমাজে এমন মনিবের সংখ্যা খুব কমই ছিল যিনি দাসীদের নিয়ে নানা অনাচার, যথেচ্ছাচার ও পাপাচারে লিপ্ত না হতেন। এ সব অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ কিংবা সংশয়ের সৃষ্টি হতো না।

পক্ষান্তরে, কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে নারকীয় দুষ্কর্ম করতে তাঁরা একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। সমাজের লোক লজ্জা ও নিন্দা এবং তাঁদের জন্য ব্যয় নির্বাহের ভয়ে অনটন ও অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের কারণে পুত্র সন্তানদেরও হত্যা করতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

কিন্তু পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি রয়েছে তার যথার্থতা নির্ণয় করা বা প্রত্যয়ণ করা একটি অত্যন্ত মুশ্কিল ব্যাপার। কারণ, গোত্রীয় বিরোধ এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় স্বপক্ষকে শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় আপন আপন সন্তানেরাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে প্রামাণিত হতো। এ প্রেক্ষিতে পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্যই আরববাসীগণের কাম্য হওয়া স্বাভাবিক।

অবশ্য এ জনশ্রুতিটি যে কোন ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমনটি বলাও বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ, ক্ষমতালিপ্সা, গোত্রপতিগণের জন্য পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্য কাম্য হতে পারে। কিন্তু অনাহারী, অর্ধাহারী, নিরীহ গোবেচারা গরীব দুঃখীদের জন্য পুত্র সন্তানের আধিক্য কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ কিংবা দুঃসময়ে পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যতদূর জানা যায় তৎকালীন আরব সমাজে সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই এবং গোষ্ঠী ও গোত্রের লোকজনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হচ্ছে, বহু গোত্রে বিভক্ত এবং গোত্রে গোত্রে রেষারেষিক্রীষ্ট আরব সমাজে গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে হতো আরববাসীগণকে। গোত্রের মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। গোত্র সমূহের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার মূলতত্ত্ব গোত্রীয় চেতনা এবং আবেগ ও অনুভূতিকে সজীব ও সক্রিয় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হতো। সাম্প্রদায়িকতা এবং আত্মীয়তাই ছিল গোত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎস। তাঁরা সেই উদাহরণকে শাব্দিক অর্থে বাস্তবে রূপদান করতেন।

জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার সারকথা বলতে গেলে শুধু এটুকুই বলতে হয় যে স্থিরতা এবং কুপমন্ডুকতাই সমাজ জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞতা, অশ্লীলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র সমাজ। অসত্য ও অন্যায়ের নিকট সত্য ও ন্যায় হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত। সাধারণ মানুষকে জীবন যাপন করতে হতো পশুর মত। বাজারের পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো মহিলাদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো মাটি ও পাথরের মতো। গোত্র কিংবা রাষ্ট্র যাই বলা হোক না কেন, প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল শক্তিমত্তা। প্রশাসন পরিচালিত হতো শক্তিদ্বারা গণের স্বার্থে। দুর্বলতর শ্রেণীর সাধারণ লোকজনের কল্যাণের কথা কস্মিনকালেও চিন্তা করা হতো না। প্রজাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থসম্পদে কোষাগার ভরে তোলা হতো এবং প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মহড়া এবং যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যেই তা সংরক্ষিত হতো।

রাজনৈতিক অবস্থা: জাযিরাতুল আরবের তিনটি সীমান্ত এলাকার জনগণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিবেশী। এই তিনটি দেশে অশান্তি, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। মানুষরা দাস ও প্রভু এই ২ ভাগে বিভক্ত ছিল। নেতারা ও বিদেশী শাসকরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করত।

দাসদের মাথায় ছিল সকল বোয়ে। ও

দাসরা সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হত। শাসকবর্গ সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম আয়েশ, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় নিমগ্ন থাকত। শাসকরা জনগণের উপর সকল প্রকার যুলুম, অত্যাচার চালিয়ে যেত জনগণ সেসব মুখ বুঁজে সহ্য করত। অভিযোগ করার কোনো উপায় ছিল না। মানুষের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। চারদিকে ঝগড়া, বিবাদ, কলহ ও বংশগত এবং

ধর্মীয় বিভেদ ছিল। আরবের ভিতরে এমন কোনো বাদশাহ ছিল না, যে জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে। প্রজাদের কোনো আশ্রয়স্থল ই ছিল না। তারা ছিল বড়ই অসহায়।

আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি:

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজের ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সেই সময় আরববাসীরা অধিকাংশই বহুদেবতাবাদে বিশ্বাস করত। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত এবং প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব দেবতা ছিল। মক্কার কাবা ঘর, যা মূলত আল্লাহর উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছিল, সেটি পরিণত হয়েছিল মূর্তিপূজার কেন্দ্রে। সেখানে প্রায় তিনশ ষাটটি মূর্তি স্থাপন করা ছিল, যেমন— হুবালা, লাত, উজ্জা, মানাত ইত্যাদি।

তখন কিছু ইহুদি ও খ্রিষ্টানও আরবে বাস করত, তবে তাদের প্রভাব সীমিত ছিল। এ ছাড়াও কিছু মানুষ ছিলেন যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণের চেষ্টা করতেন; এদের বলা হত হানিফ। কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশ ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তারা জ্যোতিষবিদ্যা, তাবিজ, গণনা এবং ভবিষ্যৎ জানার মতো অন্ধবিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; এমনকি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নৃশংস প্রথাও প্রচলিত ছিল।

এইভাবে ইসলাম আগমনের আগে আরবের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত। ইসলাম আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সেই সমাজে একেশ্বরবাদ, ন্যায়, মানবতা ও নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে দেন।

আলোর অপেক্ষায়

বহু নবীর মুখে উচ্চারিত বাণী আকাশে বাতাসে ভেসে চলছিলো— "শেষ নবী আসবেন, যিনি আনবেন আলো ও করুণা"।

সেই ক্লান্ত পৃথিবীতে মক্কার ঘরে আমিনা (রা) অনুভব করলেন শান্তি, যেন দীর্ঘ এক প্রতীক্ষার অবসান ঘটছে। পুরো পৃথিবী এই আলোকে সাদরে বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলো। নিঃশব্দে পুরো দুনিয়া অপেক্ষায় ছিলো 'আলো আসছে'— সেই আলো ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আঁধারের বুক চিড়ে প্রভাতের প্রথম আলো

রাসুলের বংশধারা: নবীজী সাঃ এর পবিত্র বংশধারা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল । এটি এমন এক বাস্তব সত্য যে, মক্কার সকল কাফির এমনকি তাঁর চরম শত্রু ও তা অস্বীকার করতে পারেনি ।

১) পিতার দিক থেকে নবীজির বংশপরিক্রমা:

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কীলাব ইবনু মুররা ইবনু কাআব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাজার ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলিয়াস ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান ।

এ পর্যন্ত নবীজির বংশধারা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এর পর থেকে আদম আ. পর্যন্ত তাঁর বংশধারা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই সেটুকু আর উল্লেখ করা হলো না।

২) মায়ের দিক থেকে নবীজির বংশ পরিক্রমা: মুহাম্মাদ ইবনু আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মনাফ ইবনু জুহরা ইবনু কীলাব

উপরিউক্ত আলোচনার পর জানা গেল যে, কীলাব ইবনু মুররা পর্যন্ত পিতা মাতার দিক থেকে বংশপরিক্রমা ভিন্ন হলেও এর পর থেকে একসঙ্গে মিলে গেছে।

জন্ম ও নামকরণ:

এ চোখ কখনও দেখেনি কোথাও এত সুন্দর আপনার সম
কোনো মা দেয়নি জন্ম কখনো আপনার মত সুন্দরতম
(জুবায়ের বিন বায়েজিদ
মূল: হাসনাত বিন সাবিত)

রাসূল সাঃ মক্কার বনি হাশেম বংশে ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।
রাসূল সাঃ এর জন্ম তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে, তাবারি খলদুন, এবনে হেশাম, কামেল
প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীরা বলেন ১২ রবিউল আবুল ফেদা বলেন, ১০ রবিউল আউয়াল।
মিশরের সুপ্রসিদ্ধ আলেম মাহমুদ পাশা ফালকী বলেন, ৯ রবিউল আউয়াল।
মোস্তফা রচিত এর বিখ্যাত লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ বলেন। সোমবার ৯ রবিউল
আউয়াল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ।
এই তারিখটি যে ৮ রবিউল আউয়াল থেকে ১২ রবিউল আউয়াল এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এ
সম্পর্কে সবাই মোটামুটি একমত।

ইবনে সাদ এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল সাঃ এর মাতা বলেছেন যে, যখন তিনি জন্মগ্রহণ
তখন দেহ থেকে একটি নূর বের হলো, সেই নূর দ্বারা শামদেশের মহল উজ্জ্বল হয়ে গেলো।
জন্মের পর তার মা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। তিনি
খুব খুশি হলেন এবং আনন্দভাবে তাকে কাবাঘরে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া ও
শুকরিয়া আদায় করলেন। এ সময় তিনি তার নাম রাখলেন মুহাম্মাদ। এ নাম আরবে পরিচিত
ছিল না। এ নাম বড় অদ্ভুদ নাম। বড় অচেনা নাম। বড় মিষ্টি নাম। মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। ৭ম
দিনে তিনি নিয়ম অনুযায়ী খণ্ডনা করলেন।

আব্দুল মুত্তালিব চান উনার এই পিতৃহীন

পৌত্র যুগ যুগ ধরে প্রশংসিত হোক পৃথিবীর সর্বত্র। জগতে তার প্রশংসা চির অমলিন হয়ে
থাক।

বিবি আমিনা নাম রাখলেন, আহমাদ, কি অপূর্ব মিল!

মুহাম্মাদ ও আহমাদ

প্রশংসিত ও প্রশংসাকারী

সুরভিত শৈশব

হালিমা (রা)-এর কোলে:

তৎকালীন আরবের পরিবেশ একজন শিশুর বিকাশের জন্য উপযুক্ত ছিলো না। তাই দুগ্ধপোষ্য
শিশুদের শহর থেকে দূরে গ্রামীণ মরুর পরিবেশে বড় করতে পাঠানোর প্রথার প্রচলন
ছিলো। যেন সেই উন্মুক্ত পরিবেশে সতেজ, সবল এবং বলিষ্ঠভাবে শিশু বড় হয়ে উঠতে পারে
এবং সেই সাথে বিশুদ্ধ আরবী আরবী ভাষাও রপ্ত হয়।

সেই রীতিমতো মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা খাত্তী অনুসন্ধান করেন। সেই সময় একদল খাত্তী শিশু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহরে আসেন। সেই দলের সকলেই একে একে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের সঙ্গে নিতে অস্বীকার করেন। কারন তিনি ছিলেন ইয়াতীম। তাকে নিয়ে গেলে উত্তম কোনো পারিশ্রমিক লাভ করতে পারবেন না এমন মনোভাবের কারনে কেউই তাকে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

খাত্তী দলের মধ্যে একজন ছিলেন হালিমা বিনতে আবু যুয়াইব। তিনি খাত্তী দলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ছিলেন। প্রত্যেকেই একটি করে শিশু সংগ্রহ করে নিলেও তিনি কাউকেই পেলেন না। এ কারনে তিনি মনে মনে প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত ছিলেন। উপায়ন্তর না দেখে স্বামীর পরামর্শে তিনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রহন করেন এবং এই শিশুর মাধ্যমেই বরকত প্রত্যাশা করেন।

মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রহন করার পর থেকে হালিমা (রা) তার জীবনে বরকতের প্রভাব অনুধাবন করতে থাকেন। তার দুর্বল গাধা এবং উট অন্য সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও অধিক দুগ্ধবতী হয়ে উঠলো। নিজেদের রিজেকের বরকত দেখে হালিমা (রা) বুঝতে পারলেন এই শিশুটি খুবই বরকতময় শিশু।

দু বছর পূর্ণ হওয়ার পর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী হয়েছিলেন। বরকতময় শিশুটিকে হালিমা (রা) নিজের কাছে আরও কিছুদিন রাখার ইচ্ছা মনে পুষে রাখেন। রবের ইচ্ছাও তেমনই ছিলো। সে সময় মক্কায় এক মহামারী ছড়িয়ে পড়ায় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাস্থ্যের ব্যপার আশংকা থেকে পুনরায় হালিমা (রা) - এর নিকট তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি হালিমা (রা) এর নিকট প্রতিপালিত হন।

মা এবং দাদার প্রস্থান:

ছয় বছর বয়সে তিনি মায়ের কোলে ফিরে যান। আমিনা (রা) তখন স্নেহের পুত্র এবং পরিচারিকা উম্মে আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারতের জন্য মদীনায যাওয়ার ব্যপারে মনস্থির করলেন। এক মাস মদীনায অবস্থানের পর মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আবওয়া নামক স্থানে এসে ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। আমিনা (রা) এর আকস্মিক মৃত্যুতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা প্রচণ্ড ব্যথা পান। তার চেয়েও বেশি কষ্ট পান ইয়াতীম শিশুটির কথা ভেবে। পরম যত্নে ও ভালোবাসায় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি দু বছর লালনপালন

করেন। অবশেষে ৮ বছর বয়সে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল দায়িত্ব উনার ছেলে আবু তালিবকে দিয়ে যান।

চাচার স্নেহে বড় হওয়া:

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি যত্নে আর ভালোবাসায় বড় করেন আবু তালিব। নানাভাবে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। অত্যন্ত দূরদর্শীতার সাথে তিনি চাচার অধীনে লালিত পালিত হতে থাকেন। চাচা তাকে নিয়ে ব্যবসায়িক সফরের উদ্দেশ্যেও যেতেন। নবুয়ত পরবর্তী জীবনেও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বিভিন্নভাবে আগলে রেখেছিলেন।

তারুণ্যের উজ্জ্বল চরিত্র

হিলফুল ফুযুল গঠন

নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যৌবনে মক্কার সম্মানিত গোত্রগুলি মিলিত হয়ে গঠন করেছিলেন একটি সামাজিক চুক্তি-সংগঠন, যার নাম হিলফুল ফুযুল— যা অন্যায়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, দুর্বল ও নিপীড়িতদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল।

এই হিলফুল ফুযুল-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল —

অত্যাচার, বঞ্চনা ও যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়ানো।

দরিদ্র, দুর্বল, অসহায়দের সাহায্য করা।

বিদেশী বা নিজ দেশি ব্যবসায়ীদের — বিশেষ করে যারা বাণিজ্যে মক্কা আসে তাঁদের — তাদের মালের ও প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কুরাইশ ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ও অযথা সংঘর্ষ রোধ করা।

যদিও নবীজি (সা.) এই সংগঠনটি নিজে প্রতিষ্ঠা করেননি, তবে তিনি এতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘটনা থেকে দেখা যায় — ইয়েমেনের যাবিদ নামের এক এলাকা থেকে একজন লোক ব্যবসা করতে মক্কায় আসে। তার পণ্য বিক্রিও করেছিলেন কিন্তু প্রাপ্য টাকা পাননি। সে মানুষের ভিড়ের মাঝে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগল “হে মক্কা বাসী আমি তোমাদের দেশে এসে যুলুমের শিকার হয়েছি, অন্যায়ের শিকার হয়েছি, হে লোকসকল, তোমরা কে আছ যে আমার পাশে দাঁড়াবে, তোমরা কি তোমাদের দেশে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে? তখন গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তির একত্রিত হয়ে হিলফুল ফুয়ুল-এর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান।

নবীজি (সা.) এই সংগঠনের বিষয়ে বলেছেন- “আমি এমন এক মৈত্রীচুক্তিতে ছিলাম যার বিনিময়ে আমি লাল উটও গ্রহণ করতাম না; যদি ইসলাম যুগে এমন আহ্বান হতো, আমি তাতে সাড়া দিতাম।”

এই চুক্তি-সংগঠন আমাদের জন্য আজও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে — সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে একতা, দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো, ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করা — এগুলো হলো ইসলামী নৈতিকতার অঙ্গ।

পরিণয়

খাদিজা (রা:)এর সঙ্গে বিবাহবন্ধন:খাদিজা (রা :) ছিলেন বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মহিলা।তখনকার আরবের ধনাঢ্য এক মহিলা।নবীজির উত্তম চরিত্রমাধুর্য আর উন্নত বৈশিষ্ট্য দেখে তাঁর অন্তরে নবীজির প্রতি অন্যরকম এক ভালোলাগা অনুভূত হয়।তৈরি হয় প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র ভালবাসা।ফলে তিনি তাঁকে নিজের করে পেতে চাইলেন।এ জন্য নিজ থেকেই তিনি তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান যে,নবীজী রাজি হলে তিনি তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান।

নবীজী সাঃ খাদিজা (রা:) এর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।তখন তার বয়স ছিল ২১ এবং খাদিজা রা: এর বয়স ছিল ৪০(অনেকের মতে ৪৫ বছরের পৌঢ় নারী ছিলেন) নবীজির বিয়ে অনুষ্ঠানে চাচা আবু তালিব

এবং বনু মুজারের নেতৃস্থানীয় প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন।বিয়ের খুতবা পাঠ করেন চাচা আবু তালিব।খুতবায় চাচা তালিব নবীজী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন,তা বিশেষভাবে

লক্ষণীয় ,কেননা নবীজির বয়স মাত্র ২১ বছর।এ বয়সে তিনি চাচার কাছ থেকে তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বীকৃতি লাভ করেন।

খাদিজার সঙ্গে নবীজির বরকতময় বিয়ে সম্পন্ন হয়।তিনি নবীজির সান্নিধ্যে দীর্ঘ ২৪ বছর অতিবাহিত করেন।এর মধ্যে কিছু সময় ওহী নাযিলের আগে এবং কিছু সময় পরে।বরকতময় দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ এই সময়ে নবীজী অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেননি।

সন্তানাদি:খাদিজা রা: এর গর্ভে নবীজির ছয়জন সন্তান জন্ম নেন।উনাদের মধ্যে দুজন ছেলে আর চারজন মেয়ে।ছেলে দুজনের নাম কাসিম এবং তাহির। কাসিমের নামানুসারেই নবীজির উপনাম ছিল ‘আবুল কাসিম ‘।

মেয়ে চারজনের নাম ছিল ১)ফাতিমা ২) জায়নাব ৩)রুকাইয়া ও ৪) উম্মু কুলসুম।

তাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন জায়নাব রা:।

নবীজির সকল সন্তানই খাদিজার গর্ভজাত।তবে ইব্রাহিম নামে তার তৃতীয় একজন ছেলে ছিলেন,যিনি মারিয়া কিবতিয়া রা: এর গর্ভে জন্মান।তার এই তিন পুত্রসন্তানের সবাই শৈশবে ইন্তিকাল করেন। তবে কাসিম সম্পর্কে কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় যে ,তিনি বাহনে চড়ার বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

নবীজির কন্যা ও স্ত্রীগণ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মোট চারজন কন্যা ছিলেন— হযরত য়ায়নাব (রাঃ), হযরত রুকাইয়া (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ)। এঁদের সকলেই ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান, ধর্মপরায়ণ ও ধৈর্যশীলা নারী। নবীজির কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যা, যিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং নবীজির বংশধারা তাঁরই মাধ্যমে টিকে আছে।

হযরত য়ায়নাব (রাঃ) ছিলেন নবীজির বড় কন্যা। তিনি আবু-আস ইবনুর রাবি’র সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর বহু কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

হযরত রুকাইয়া (রাঃ) ছিলেন দ্বিতীয় কন্যা। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং নবীজির হিজরতের আগে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) তৃতীয় কন্যা। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর তাকেও হযরত উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। এজন্য উসমান (রাঃ)-কে “যুন-নুরাইন” (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন নবীজির কনিষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁদের সন্তান হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) নবীজির বংশধারাকে বহন করেন।

নবীজির এই চার কন্যাই ছিলেন শুদ্ধ চরিত্রের, ধৈর্যশীলা ও ধর্মনিষ্ঠ নারী। তাঁরা নবীজির জীবন ও দাওয়াতি কাজে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

নবীজির মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন।

নবী করিম (সাঃ)-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন হযরত খাদিজা (রাঃ)। তিনিই ছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সহধর্মিণী, যিনি নবুয়তের কঠিন সময়ে সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সর্বদা নবীজিকে সাহায্য ও সাহায্য দিয়েছেন। খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর নবীজির জীবনে আরও কয়েকজন স্ত্রী আসেন— যেমন হযরত সাওদা (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত উম্মে সালামা রাঃ, জায়নাব বিনতু জাহাশ, সাফিয়া বিনতু হুয়াই, জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিস খুজাইয়া, মাইমুনা বিনতু হারিস হিলালিয়া প্রমুখ তাঁদের বিয়ে মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ছিল— ইসলাম প্রচার, বিধবা নারীদের আশ্রয় এবং মুসলিম সমাজে আদর্শ গড়ে তোলার জন্য।

নবীজির পরিবারের প্রতিটি সদস্যই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের জীবন ও চরিত্র মুসলমানদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

আল-আমিন হিসেবে পরিচিতি: কাবাঘর পুনর্নির্মাণ:

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর তরুণ বয়সের জীবনধারা ছিল শান্ত, সৎ ও কর্মঠ। তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন সত্যবাদী, আমানতদার ও পরিশ্রমী। তাঁর মধ্যে এমন গুণাবলি ছিল যা তাকে সমাজে সবার কাছে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। মক্কার সমাজে যখন মানুষ ছিল নানা অন্যায়, পাপাচার, প্রতারণা ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত, তখন মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা এক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার জন্য মক্কার মানুষ তাঁকে ‘আল-আমিন’ অর্থাৎ “বিশ্বস্ত” উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

তাঁর বাল্য ও যৌবনে তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি, কারও সাথে প্রতারণা করেননি, বরং সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পথে চলেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় সততার উদাহরণ। তিনি খদিজা (রা.)-এর ব্যবসার কাজে যোগদান করে এমন নিখুঁত সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন যে, খদিজা (রা.) নিজেই তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীতে তাঁকে বিবাহ করেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর এই গুণাবলির কারণেই তিনি সমাজে সকলের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ

মক্কার কাবা ঘর বহু প্রাচীন একটি পবিত্র স্থান। নবী ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) আল্লাহর আদেশে এই ঘর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার কারণে কাবা ঘরটির দেয়াল ভেঙে পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কাবা ঘরটি নতুন করে পুনর্নির্মাণ করবে। সবাই আন্তরিকভাবে এতে অংশগ্রহণ করে, তবে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, নির্মাণকাজে কেবল বৈধ অর্থই ব্যবহার করা হবে—চুরি, সুদ বা অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ নয়।

যখন দেয়ালগুলো পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হলো, তখন হাজরে আসওয়াদ (পবিত্র কালো পাথর) কোন গোত্র স্থাপন করবে তা নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। প্রত্যেক গোত্রই চেয়েছিল এই মহান কাজের সম্মান তাদের ভাগে পড়ুক। কয়েক দিন পরও মতের মিল না হওয়ায় রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে এক জ্ঞানী ব্যক্তি পরামর্শ দেন যে, আগামী সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম হারাম শরিফে প্রবেশ করবে, তাকেই বিচারক ধরা হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই ব্যক্তি ছিলেন যুবক মুহাম্মদ (সা.)।

তাঁকে দেখে সবাই খুশি হয়ে বলল, “এই যে আসছেন আল-আমিন! আমরা তাঁর বিচারেই রাজি।” তখন নবী মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে সমস্যার সমাধান করেন। তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদটি তার ওপর রাখেন, এবং চারটি প্রধান গোত্রের নেতাকে চাদরের চার কোণ ধরে একসাথে তা কাবা ঘরের কাছে নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করেন।

এই বিচক্ষণ ও ন্যায়সংগত কাজের মাধ্যমে বড় রক্তপাত এড়ানো যায়, এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বগুণে সবাই মুগ্ধ হয়। এই ঘটনাই তাঁকে মক্কার সমাজে সর্বজনপ্রিয় “আল-আমিন” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অতএব, আল-আমিন উপাধি শুধু একটি নাম নয়, বরং এটি মানবতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)-এর এই উপাধি আজও পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর এই মহান চরিত্র মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন আদর্শ ও নৈতিকতার শিক্ষা হয়ে থাকবে চিরকাল।

হেরা গুহায় আলোকবার্তা

গুহীর সূচনা ও নবুয়তপ্রাপ্তি:খাদিজা রা: সহিত বিবাহের পর হযরত মুহাম্মাদ সা: অভাব ও দৈন্যের হাত হতে মুক্ত হয়েছিলেন।তাই তিনি আত্মচিন্তায় অধিকতর সময় হেরা। গুহায় একাকী ধ্যান করতেন।তিনি শৈশব হতেই চিন্তাশীল ছিলেন।

রজনী গভীর , মুহাম্মাদ ধ্যানমগ্ন।এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকতেছে ,”মুহাম্মাদ”।

মুহাম্মাদ সাঃ নয়ন মেলিয়া দেখিলেন ,এক জ্যোতির্ময় ফেরেশতা তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান। তাঁরই জ্যোতিতে গুহা আলোকিত হয়ে গিয়েছে।ইনিই আল্লাহর বাণীবাহক ফেরেশতা জিব্রাইল।জিব্রাইল মুহাম্মাদকে বলিলেন “ইক্বরা”-তিলোওয়াত করো।

মুহাম্মাদ সা: কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন “আমি পড়তে জানি না”

জিব্রাইল তখন মুহাম্মাদ সা: কে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং পুনরায় বললেন ,”ইক্বরা”।

মুহাম্মাদ সা: এবারও উত্তর দিলেন , আমি পড়তে পারি না।জিব্রাইল আবারও তাকে আলিঙ্গন করলেন।এভাবে তিনবার করার পর মুহাম্মাদ সা: এর মুখ হতে নিঃসরিত হলো :” ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল লাজি খলাক্ব”।

“পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সমস্ত সৃষ্টি করেছেন”।

আকস্মিকতায় নবীজী সাঃ বিহ্বল হয়ে পড়েন।ঘরে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী খাদিজা রা: কে বলেন, “জাম্মিলুনি , জাম্মিলুনি আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও !আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও ! নবীজী সাঃ তখন ও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন।

মা খাদিজা নবীজিকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন, কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিনি খাদিজা রাঃ এর কাছে সব কথা খুলে বললেন।

নবীজী অনেক আতঙ্কিত ছিলেন, সব শুনে খাদিজা রাঃ তাঁকে অভয় দিলেন এবং বললেন “আপনি ন্যায়পরায়ণ, আত্মীয়স্বজনদের হক আদায় করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন। আপনার সাথে যা ঘটেছেটা কখনোই শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না।

তিনি জানতেন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁকে হেফাজত করবেন।

এরপর খাদিজা (রাঃ) নবীজিকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের কাছে যান। ওয়ারাকাহ আইয়ামে জাহেলিয়াতে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন,

তিনি তখন বয়স্ক এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। নবীজির ঘটনার কথা শুনে তিনি বলেন, “এটি সেই ফেরেশতা, যিনি একসময় মুসা (আঃ)-এর কাছে নাযিল হয়েছিলেন। হে মুহাম্মদ! আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রেরিত নবী। আপনার জাতি যখন আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকি, আপনাকে সাহায্য করব।” এভাবেই ওয়ারাকাহ নবুয়্যতের সত্যতা ঘোষণা করেন। এই ঘটনাই ছিল নবীজির নবুয়্যতের সূচনা— এক নতুন আলোর যুগের সূচনালগ্ন, যার মাধ্যমে মানবজাতি অন্ধকার থেকে হিদায়াতের পথে এগিয়ে যায়।

অবিশ্বাসের ঝড় এবং ধৈর্যের সমুদ্র

দাওয়াতের সূচনা: ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াহ ছিল গোপন পর্যায়ে, কুরআনে আল্লাহ এই আদেশ করেছেন।

“আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।”

এই আয়াত যখন নাজিল হলো তখন মুহাম্মাদ সাঃ বেরিয়ে পড়লেন এবং আস সাফা পাহাড়ে উঠে বলে উঠলেন, “ইয়া সাবাহা!” খুব গুরুতর কোনো ঘটনা হলে এই কথাটি বলা হয়। কাজেই যারা তাঁর ডাক শুনতে পেল, তারা তার দিকে চলে গেল এবং যারা যেতে পরছিল না তারা অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল তিনি কি বলেন তা শুনে আসার জন্য।

যখন সবাই একত্রিত হলো, রাসূল সাঃ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পিছনে এক সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের অতর্কিতে হামলা করার জন্য, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে??

-আমরা তো কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।

- আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে, যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাহলে তো তোমাদের উপর আপতিত হবে।”

রাসূল সাঃ এর এই কথা গুলোই ছিল কুরাইশদের প্রতি ইসলামের প্রথম দাওয়াহ।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তা অনুধাবনের ক্ষমতা সকলের ছিল না। তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো, ‘ তোমার সারা দিন মাটি হোক ,এই কথা বলতে তুমি আমাদের ডেকেছো ?আবু লাহাব খুবই বিরক্ত ও রাগান্বিত হলেন। কুরাইশরা তখন ছিল প্রচণ্ড দুনিয়াবি এবং তারা ওই সময়টা নিছক টাকা কামানোর সময় মনে করত

কিন্তু আমাদের প্রিয় রাসূলকে আর কোনোভাবেই আটকানো সম্ভব হয় নি।

এরপর থেকে নবীজী সাঃ প্রতিদিন মানুষকে তাওহীদের পথে আহ্বান করতেন, মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতেন এবং ন্যায়, দয়া, সত্যতা ও মানবতার শিক্ষা দিতেন। তাঁর এই দাওয়াত মক্কার সমাজে এক নতুন আলো ছড়িয়ে দেয়, যদিও অনেকেই এর বিরোধিতা করে তাঁকে নির্যাতন করতে শুরু করে।

তবুও নবীজী সাঃ দৃঢ়ভাবে আল্লাহর পথে অবিচল থাকেন। তাঁর দাওয়াত ধীরে ধীরে মক্কা, মদিনা ও আরব উপদ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সত্য, ধৈর্য ও দাওয়াতের এই সংগ্রামই পরবর্তীতে ইসলামকে বিশ্বের এক মহান ও শাস্ত্রত ধর্মে পরিণত করে।

প্রলোভন ও অত্যাচার:

রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত শুরু করলেন, তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগল। তারা নবীজীকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর ও কবি বলে অপবাদ দিতে লাগল। রাসূল সাঃ মানুষের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা প্রচার করায় তাদের অহংকার ও স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই তাঁকে দাওয়াত থেকে বিরত রাখতে তারা নানা রকম অত্যাচার ও প্রলোভনের আশ্রয় নেয়। কেউ তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিত, কেউ মাথার উপর আবর্জনা ফেলে দিত, আবার কেউ তাঁকে উপহাস ও গালিগালাজ করত।

তারা নবীজীকে প্রলোভন দেখিয়ে বলত, “যদি তুমি এই দাওয়াত বন্ধ করো, আমরা তোমাকে মক্কার নেতা বানাবো, ধন-সম্পদে ভরিয়ে দেব, এবং তোমাকে সুন্দরী নারীর সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দেব।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাঃ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, “যদি তারা আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চাঁদ রাখে, তবুও আমি এই দাওয়াত ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা পূর্ণ করেন বা আমি এ পথে প্রাণ দেই।”

প্রলোভনে ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা এরপর তাঁর অনুসারীদের উপরও চরম নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু নবীজী ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সব কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর দাওয়াত চালিয়ে যান।

হত্যার পরিকল্পনা: কুরাইশদের নেতারা যখন বুঝতে পারল যে, নবী করিম সা: এর প্রচার ও ইসলামের বিস্তার তাদের প্রভাব ও স্বার্থের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তারা দারুন নাদুয়াতে একত্রিত হয়ে পরামর্শ নেয় কীভাবে নবীজিকে থামানো যায়। শেষ পর্যন্ত আবু জাহলের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে সাহসী যুবক নেওয়া হবে, এবং তারা সবাই একসাথে নবীজিকে আঘাত করবে, যাতে হত্যার দায় কোনো এক গোত্রের উপর না পড়ে। এভাবেই তারা পরিকল্পনা করেছিল রাসূল সাঃ কে হত্যা করার, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সেই ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদে রক্ষা করেন। আল্লাহর নির্দেশে নবীজী রাতেই মক্কা ত্যাগ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদিনার পথে রওনা হন, ফলে মুশরিকদের চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবিসিনিয়ায় হিজরত:

ইসলামের সূচনালগ্নে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর যখন নির্যাতন, মানসিক চাপ ও সামাজিক বয়কট ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে, তখন নবী মুহাম্মদ সা: সহানুভূতিশীল ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হিসেবে তাঁর কিছু সাহাবিকে নিরাপদ স্থানে হিজরতের অনুমতি দেন। সেই সময় আরব উপদ্বীপের বাইরে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশী। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার, সহানুভূতি এবং ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই নবী সা: সাহাবিদের বলেন যে, “তোমরা আবিসিনিয়ায় যাও, সেখানে এমন এক রাজা আছেন যাঁর দেশে কেউ অন্যায়ের শিকার হয় না।”

প্রথম হিজরত দলে ছিলেন ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী, যাদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান (রা.) ও রাসূলের কন্যা রুকাইয়া (রা.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মক্কার কুরাইশরা তাঁদের থামাতে ব্যর্থ হয় এবং মুসলমানরা নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে রাজা নাজ্জাশীর সুরক্ষার আওতায় জীবনযাপন শুরু করেন। পরবর্তীতে নির্যাতন আরও বাড়লে দ্বিতীয়বার আরও বড় একটি দল—প্রায় ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮-১৯ জন মহিলা—আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

কুরাইশরা মুসলমানদের ফেরত আনতে দু'জন দূত পাঠায় এবং নাজ্জাশীর সামনে মিথ্যা অপবাদ তোলে। কিন্তু সাহাবি জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান ব্যাখ্যা করলে নাজ্জাশীর হৃদয় স্পর্শিত হয়। তিনি কুরাইশদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা দেন যে মুসলমানরা তার দেশে পূর্ণ নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবে।

আবিসিনিয়ায় হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক,। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজ একটি শত্রুভূত পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ পরিবেশে ইবাদত, শিক্ষা ও সংগঠিত জীবন গড়ার সুযোগ পায়। আল হাবসা ছিল একটি খ্রিষ্টান প্রধান দেশ। কিন্তু পশ্চিমের ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো আন নাজ্জাশীর দেখা মিলে নি। একই সঙ্গে এটি মানবিক সম্পর্ক, ধর্মীয় সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

চাচা আবু তালিবের ইত্তিকাল:

চাচা আবু তালিবের ইত্তিকাল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এক ঘটনা। আবু তালিব ছিলেন নবী করিম সাঃ-এর চাচা, অভিভাবক ও সর্বদা রক্ষাকারী। নবীজী ছোটবেলা থেকেই তাঁর তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছেন। নবুয়তের পর কুরাইশের পক্ষ থেকে যত অত্যাচার-নির্যাতন এসেছে, আবু তালিব সবসময় তাঁর ভতিজাকে রক্ষা করেছেন। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করেননি, তবুও নবীজীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সমর্থন ও দৃঢ় অবস্থান ছিল অটুট।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। নবীজী সাঃ বারবার তাঁর কাছে গিয়ে ঈমানের দাওয়াত দেন এবং অন্তত একবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলার অনুরোধ করেন। কিন্তু কুরাইশের নেতা আবু জাহল ও অন্যরা তাঁর পাশে উপস্থিত থেকে পুরনো ধর্মে থাকার জন্য চাপ দিতে থাকায় তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। অবশেষে তিনি নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মেই মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা নবীজীকে গভীরভাবে ব্যথিত করে।

আবু তালিবের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য বড় একটি বিপর্যয় ছিল। তাঁর জীবিত অবস্থায় কুরাইশ নবীজীকে সরাসরি ক্ষতি করতে সাহস পেত না; কিন্তু তাঁর ইত্তিকালের পর অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। ইসলামের দাওয়াতের কাজে নবীজী সাঃ নিজেদেরকে আগের চেয়ে অনেক বেশি

একাকী অনুভব করেন। পরবর্তীতে একই বছরে প্রিয় স্ত্রী খাদিজা রা.-এর ইন্তিকালও ঘটে, যার কারণে নবীজী সাঃ বছরটিকে “আমুল হুজুন”—বা শোকের বছর নামে অভিহিত করেন।

চাচা আবু তালিবের ইন্তিকাল নবীজীর জীবনে যেমন ব্যক্তিগত ক্ষতি, তেমনি দাওয়াতের পথেও ছিল একটি কঠিন মোড়, যা পরে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য নতুন দরজা খুলে দেন—তায়েফের দাওয়াত, মিরাজ এবং পরবর্তীতে মদিনা হিজরত।

মিরাজের রাত

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে অনন্তের পথে

নবুয়তের ৫ম বছর ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছরই ফখরুল আশ্বিয়াকে মর্যাদাপূর্ণ এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান সকল নবী রাসূলদের মধ্যে শুধু নবীজীরই অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, একরাতে রাসূল সাঃ কাবার হাতিমে শায়িত ছিলেন। এমন সময় জিব্রাইল ও মিকাইল আ. এসে বললেন ‘আমাদের সঙ্গে চলুন’। নবীজিকে তখন বুরাক নামক একটি বাহনে চড়ানো হয়। এটি অনেক দ্রুতগামী ছিল। প্রথমে শামের আল আকসা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলকে তাঁর সম্মানার্থে (মুজিজা ছিল) সমবেত করে রেখেছিলেন। এইখানে আমাদের নবীজী সাঃ সকল নবী রাসূল ও ফেরেশতাদের নামাজের ইমামতি করেন।

এরপর নবীজিকে আকাশসমূহে ভ্রমণ করানো হয়। প্রথম আকাশে আদম আ. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হয়। দ্বিতীয় আকাশে ইসা ও ইয়াহইয়া, তৃতীয় আকাশে ইউসুফ, চতুর্থ আকাশে ইদরিস, পঞ্চম আকাশে হারুন, ষষ্ঠ আকাশে মুসা আ. এবং সপ্তম আকাশে ইব্রাহিম আ. সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এরপর নবীজী সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশরীফ নেন। পথিমধ্যে হাউজে কাউসার অতিক্রম করেন। এরপর জন্মতে প্রবেশ করেন। সেখানে আল্লাহর সেসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর নিদর্শন অবলোকন করেন, যা আজ পর্যন্ত কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, এবং কোনো মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যে পর্যন্ত যেতে পারেনি। এরপর তাঁর সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়, যা সব ধরনের শাস্তি আর তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর ছিল।

এরপর তিনি আরও সামনে অগ্রসর হন,তবে জিব্রাইল আ. সেখানেই থেমে যান।কেননা ,এখন থেকে সামনে এগোনোর অনুমতি তাঁর ছিল না।এবার তিনি আল্লাহ তায়ালার দর্শন বা দিদার লাভ করলেন,সেখানে তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন এর সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই নামাজ ফরজ হয়।

এরপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে পুনরায় বুরাকে চড়ে ভোর হওয়ার আগে মক্কায় ফেরেন।

ভোর হওয়ার আগেই এই বরকতময় সফর শেষ হয়ে যায়।

নবীজির মেরাজের ঘটনা আবু বকর রা: ছাড়া কেউই বিশ্বাস করেনি।এ কারণে তাঁর উপাধি ‘সিদ্দিক ‘ বা বিশ্বাসী রাখা হয়।

রক্তমাখা পথে দোয়ার ঝর্ণাধারা:আত তাইফ

আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবীজির উপর নির্যাতনের অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়।ফলে তাঁরা তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে একটি মুহূর্ত ও বিরত থাকেনি।যখন মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হতাশা জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়,তখন নবীজী সে বছরই অর্থাৎ,নবুয়তের দশম বছর শাওয়া লের শেষ দিকে জায়েদ ইবনুল হরিসাকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফে যান এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন।সেখানে দীর্ঘ এক মাস তাদের মধ্যে তাবলীগ ও হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

কিন্তু একটি লোকের ভাগ্যেও সত্যগ্রহণের সুযোগ হয় নি।উল্টো তারা তাঁকে কষ্ট দিতে শহরের কিছু বখাটে ও লম্পট ছেলেকে লেলিয়ে দেয়।এই হতভাগারা নবীজির পেছনে লেগে যায়।যদি রহমাতুল্লিল আলামীনের দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিবন্ধক না হতো ,তাহলে তাঁর পবিত্র ঠোঁট নড়লেই তাদের এসব অপকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে যেত।পরিণতিতে তায়েফ ও তায়েফবাসীদের নামনিশানা পর্যন্ত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এই হতভাগারা নবীজির অপর এমন ভাবে পাথর নিক্ষেপ করে যে, তাঁর পা রক্তাক্ত হয়ে যায়। জায়েদ ইবনু হরিসা রা. যে দিক থেকেই পাথর আসতে দেখতেন,তিনি সে দিকেই দাঁড়িয়ে নবীজিকে রক্ষা করতেন এবং নিজেই পাথরের আঘাত মাথা পেতে নিতেন।অবশেষে জায়েদ রা. এর মাথা ও আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যায়। পাথরের আঘাতে রাসুল সাঃ এর পায়ের রক্তে জুতো ভিজে গিয়েছিল।

তাঁরা আশ্রয় নেন মক্কার একটি বাগানে,তিনি হেলান দিয়ে আগুর গাছের ছায়ায় বসলেন।রাসূলুল্লাহর মন প্রচণ্ড খারাপ,তায়েফে তিনি এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবেন আশা করেন নি।প্রচণ্ড কষ্ট আর মনোবেদনা থেকে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করলেন, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আবেগময় একটি দুআ--

‘ হে আল্লাহ ,আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা ,অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি।দয়ালু দাতা,তুমি দুর্বলদের রব,তুমি আমার ও রব,তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ?আমাকে কি এমন কারো কাছে ন্যস্ত করছ ,যে আমার সাথে রক্ষ ব্যবহার করবে??নাকি কোনো শত্রুর হাতে ন্যস্ত করছ যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ ?যদি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোনো দুঃখ নেই, আফসোস ও নেই।তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত কর।আমি তোমার ক্রোধ ও অভিশাপ থেকে তোমার সে আলোয় আশ্রয় চাই যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়।দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত।সকল ক্ষমতা এবং শক্তি শুধু তোমারই।তোমার শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।”

এত নির্যাতিত হওয়ার পর ও আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবান থেকে বদদুআর একটি শব্দ ও উচ্চারিত হয় নি।

মদিনার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ

মদিনায় হিজরত: কুরাইশের কাফিররা যখন সামগ্রিক বিষয় জানতে পারে ,তখন তারা নবীজির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ‘ দারুন নাদওয়ায় ‘ সমবেত হয়।দারুন নাদওয়ায় সেই বৈঠকে কেউ কেউ তাকে বন্দির পরামর্শ দেয়;আর কেউ দেয় দেশান্তরের পরামর্শ।তবে তাদের ধূর্ত লোকেরা বলে ,এগুলোর কোনোটিই করা উচিত হবে না।কেননা,বন্দী করা হলে তাঁর সমর্থক ও সাথীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেবে;আর দেশান্তর করা হলে তা হবে আমাদের জন্য ক্ষতিকর।কেননা , এমতাবস্থায় আশেপাশের সকল আরব তাঁর উত্তম চরিত্র ,মিষ্টি কথা এবং পবিত্র কালামের অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবেন।

তখন হতভাগা আবু জাহল পরামর্শ দেয় যে, তাঁকে হত্যা করা হোক।তবে এ হত্যায় সব গোত্রের একজন করে লোক অংশ নেবে ,যাতে বনু আবদি মানাফ (নবীজী সাঃ এর গোত্র)এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে।তখন উপস্থিত সবাই তার এই প্রস্তাব পছন্দ করে এবং সব গোত্র থেকে একজন করে যুবককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়।তাদের বলে দেওয়া হয় যে,অমুক রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন এবং তাঁকে দ্রুত হিজরতের নির্দেশ দেন।যে রাতে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক কাফিরদের হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নবীজির ঘরের চারদিকে ঘেরাও করে,ঠিক সে রাতেই নবীজী হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।এ সময় তিনি আলীকে বলেন,তিনি যেন তার খাটে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন,যাতে কাফিররা এটা জানতে না পারে যে,তিনি ঘরে নেই।

এরপর নবীজী ঘর থেকে বের হন,তখন তাঁর দরজায় কাফিরদের যেন মেলা জমে তিনি সূরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হন এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের চোখে পর্দা ফেলে দেন।তারা আর নবীজিকে দেখতে পায় নি।এরপর তিনি আবু বকরের বাড়িতে যান।আবু বকর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং একজন পথ প্রদর্শক ও প্রস্তুত করে রাখেন।

এভাবেই তাঁরা উভয় মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সাওর গুহায় অবস্থান:

মদিনায় হিজরতের সময় নবীজী সাঃ ও আবু বকর (রা.)-এর সাওর গুহায় অবস্থান ছিল আল্লাহর কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।কুরাইশরা এ সময় ঘোষণা দেয়,যে নবীজীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে পারবে , তাকে উপহার হিসেবে ১০০ উট দেওয়া হবে।তখন অনেক লোক লোভে পড়ে চারদিকে অনুসন্ধান শুরু করে।তাদের অনুসন্ধান করতে করতে একদল লোক সাওর গুহার একেবারে মুখ পর্যন্ত এসে যায়।আবু বকর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, “হে রাসুলুল্লাহ, তারা যদি পা নিচে নামিয়ে তাকায়, আমাদের দেখে ফেলবে!” তখন নবীজী সাঃ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, “ভয় পেও না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।” আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যে তারা গুহার সামনে দাঁড়িয়েও প্রবেশ করার প্রয়োজন মনে করেনি।কেননা আল্লাহর নির্দেশে গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সা রাতারাতি জল বুনে রেখেছিল এবং বন্য কবুতর ঠিক গুহার প্রবেশপথে বাসা তৈরি করে ফেলেছিল!মনে হয়—এই জায়গায় বহুদিন ধরে কেউ আসেনি।

নবীজী সাঃ ও আবু বকর (রা.) গুহায় মোট তিন রাত অবস্থান করেন।এ সময়ে তাদের খাদ্য ও খবর পৌঁছে দিতেন আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ, যিনি রাতের অন্ধকারে গুহায় এসে দিনভর মক্কায় মানুষের মধ্যে মিশে শত্রুদের সব তথ্য সংগ্রহ করতেন।আর আবু বকর (রা.)-এর মেয়ে আসমা (রা.) সাহসিকতার সাথে খাবার পৌঁছে দিতেন; এমনকি শত্রুরা

জিজ্ঞেস করলে তিনি বুদ্ধিমত্তায় উত্তর দিতেন। তাদের রাখালেরাও কৌশলে পশুপাল নিয়ে গুহার পথে হাঁটত, যাতে আসমা (রা.)-এর পায়ের চিহ্ন মুছে যায়।

তৃতীয় রাতের শেষে রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার, মদিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। অভিজ্ঞ আব্দুল্লাহ ইবন উরাইকিত উট নিয়ে হাজির হন। তিনি নিরাপদ ও অপরিচিত একটি পথে মদিনার দিকে যাত্রা পরিচালনা করেন। নবীজী সাঃ ও আবু বকর (রা.) গোপনে গুহা ত্যাগ করে তাদের দীর্ঘ, ঐতিহাসিক হিজরতের যাত্রা শুরু করেন। সাওর গুহার এই অবস্থান ইসলামের ইতিহাসে তাওয়াঙ্কুল, ধৈর্য, সাহস এবং আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়।

মদিনায় প্রবেশ: মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাঃ এর প্রবেশ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক আনন্দময় ও যুগান্তকারী ঘটনা। সাওর গুহা থেকে নিরাপদে যাত্রা করে যখন তিনি কুবায় পৌঁছান, তখন মদিনার প্রতিটি ঘর-বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মানুষ ছাদে, রাস্তায়, উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছিল। অবশেষে নবীজী সাঃ যখন মদিনায় প্রবেশ করেন, সবাই উচ্ছ্বাসে তাকবির ধ্বনি তোলে এবং খুশিতে বলে ওঠে—“তালাআ আল-বাদরু আলাইনা”, অর্থাৎ “পূর্ণ চাঁদ আমাদের ওপর উদ্ভিত হয়েছে।” ছোট-বড় সবাই তাঁর চারদিকে ভিড় করে, প্রতিটি হৃদয় উল্লাস ও সম্মানের অনুভূতিতে ভরে ওঠে। মদিনার মানুষ তাঁকে নেতা, শিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে বরণ করে নেয়। পথিমধ্যে নবীজী সাঃ যে আনসার সাহাবীর বাড়ির সামনে পড়ত, তিনিই নবীজির কাছে আবেদন করেন, ‘আমার দরিদ্র এ ঘরে তাশরিফ রাখুন’। তিনি তাদের বলেন, তোমরা উটনীকে তার নিজের মতো করে চলতে দাও, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত। তাকে যেখানে থামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সে নিজেই থেমে যাবে। ফলে সেটি তার মতো করে চলতে লাগল। এক পর্যায়ে নবীজির মামার বংশ আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর বাড়ির সামনে গিয়ে উটনীটি বসে পড়ে। সৌভাগ্যের সীতারা হয় আবু আইয়ুবের মেহমান হন নবীজী সাঃ এবং বেশ কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে থাকেন।

তাঁর আগমন শুধু একটি শহরকে নয়, বরং সমগ্র আরবকে নতুন শান্তি, মানবতা ও ন্যায়নীতির পথ দেখিয়েছিল। মদিনায় তাঁর এই ঐতিহাসিক প্রবেশই ইসলামি সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন এবং ইসলামের প্রসারের নতুন যুগের সূচনা করে।

মসজিদে নববি নির্মাণ:

তখন পর্যন্ত মদিনায় কোনো মসজিদ ছিল না। তাই যেখানে সুযোগ হতো, সেখানেই নামাজ পড়া হতো।

নবীজী সাঃ মদিনায় আসার পর উটনীটি প্রথমে যে জায়গায় থেমেছিল, সে জায়গাটি কিনে সেখানেই মসজিদে নববি নির্মাণ করেন।

মসজিদে নববির দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের, খুঁটি ছিল খেজুরগাছ আর ছাদ খেজুর গাছের ডাল দিয়ে তৈরি। মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিসের দিকে। কেননা, তখন পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। মসজিদের সঙ্গে দুটি কক্ষ ও তৈরি করা হয় — একটি আয়েশা ও আরেকটি সওদা রা. এর জন্য। এরপর নবীজী একজনকে মক্কায় পাঠিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদের মদীনায়ে নিয়ে আসেন। এ সময় আবু বকর রা. ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে মদিনায় নিয়ে আসেন। ফলে উম্মুল মুমিনিন সওদা রা. এবং নবীজির ২ মেয়ে ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম রা. ও মদিনায় চলে আসেন। এ ছাড়া অপর মেয়ে জায়নাব রা. কে তাঁর স্বামী আবুল আস মদিনায় আসতে দেয় নি।, যেহেতু আবুল আস তখন ও মুসলমান হন নি। অপরদিকে আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ রা. তাঁর মা ও দুই বোন আয়েশা ও আসমাকে নিয়ে মদিনায় চলে আসেন।

এ পর্যায়ে কতিপয় অক্ষম ও দুর্বল মুসলমান মক্কায় রয়ে যান। যাদের সফর করে মদিনায় আসার মতো শারীরিক শক্তি ছিল না। তবে তাঁদের কেউ কেউ মদিনার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ইন্তিকাল করেন।

আনসার ও মুহাজিরদের মিলন:

হিজরতের পর নবীজী সাঃ মদিনায় আগমন করলে মুহাজিরদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন পরিবেশে টিকে থাকা। তারা ঘরবাড়ি, সম্পদ ও আপনজন সবকিছু মক্কায় রেখে নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় এসেছিলেন। ঠিক এই সময়ে আনসাররা—মদিনার সহৃদয় মুসলমানরা—অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ ও ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দেন। তারা মুহাজিরদের শুধু স্বাগতই জানাননি; বরং নিজেদের ঘর, সম্পদ, খাবার, বাগান—সবকিছুই ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। কেউ কেউ দুই স্ত্রী থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইকে বিবাহের সুযোগ দিতেও প্রস্তুত হন। নবীজী সাঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন, যাতে একজন আরেকজনের উত্তরাধিকারী পর্যন্ত হতে পারতেন। এই বন্ধন ছিল শুধু সামাজিক সহায়তা নয়, বরং ঈমানভিত্তিক এমন এক ভালোবাসা, যেখানে স্বার্থহীনতা, ত্যাগ ও

মানবিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ফুটে ওঠে। মদিনার এই মিলন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

আযানের সূচনা: মসজিদ - ই - নববীর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কিভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিল, খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা ব্যবহার করা, অথবা মদিনায় ইলুদীরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করত সেরূপ কিছু করা। কোনো প্রস্তাব ই রাসূলের মন: পুত হলে না। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহর একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবন যাইদ রা. একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান। লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি কেন এই ঘণ্টাটি চাও?’ আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে, তিনি এটি দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। লোকটি উত্তরে বললো যে, তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়ে ও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কি? লোকটি তাঁকে বলতে লাগল,

আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ্ আকবার!

আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ্ আকবার!

আশ- হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশ- হাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

হাইয়্যা ‘আলাস - সালাহ

হাইয়্যা ‘আলাস - সালাহ

হাইয়্যা আলাল ফালাহ

হাইয়্যা আলাল ফালাহ

আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ্ আকবার!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রাসূল সাঃ বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আযান দেওয়া শিখিয়ে দিতে। বিলালের কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর। আজানের শব্দ শুনে উমার রা. দ্রুত মসজিদে আসেন। তিনি বললেন যে, তিনিও স্বপ্নে এই কথা গুলো শুনছেন। একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য।

সেই থেকে আযান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি।যে সব জায়গায় প্রকাশ্যে আযান দেওয়া হয়।সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয়।

মদিনার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ

মদিনা সনদ:মদিনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস।এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা।এ ধরনের জটিলতা নিরসনে রাসূল সাঃ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদিনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে।

চুক্তিপত্রের কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১)এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সম্পাদিত।কুরাইশ এবং ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত।এটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী, মিত্র এবং সহযোগী।

২)এর সকল এক উম্মাত,অন্যদের থেকে আলাদা।

৩)কুরাইশদের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে।নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দির মুক্তিপণ বহন করবে।আর তা হবে মুমিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

৪)বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে।নিজদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজের বন্দির মুক্তিপণ বহন করবে।আর তা করবে মুমিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

৫) যারা বাড়াবাড়ি করবে,সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে,যদিও বা তাদের সম্মান হয়।

৬)এক মুমিন অন্য মুমিনকে কোনো বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

৭)কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না।

৮)ইহুদীরা মুহাম্মাদের অনুমতি ব্যতীত (যুদ্ধার্থে)বের হবে না।

৯) মদিনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে।

১০)নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না কুরাইশকে,আর না তাকে যে কুরাইশের সাহায্য করবে।

১১)ইহুদীরা বহন করবে তাদের নিজের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের।

১২)চুক্তির সকল পক্ষ মদিনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করবে।

এই ধারাগুলো মদিনা সনদের ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের মূলনীতি প্রতিফলিত করে।

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা:

মদীনায হিজরতের পর তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সলাত আদায় করতেন। তিনি জিবরীল (আঃ) কে বলেছিলেন- আমার আশা, আল্লাহ্ তা‘আলা যেন আমার চেহারা ইহুদীদের কিবলা হতে ফিরিয়ে দেন। জিবরীল বললেন- আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। আপনি আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন এবং তাঁর কাছেই বিষয়টি বলুন। তিনি কিবলা পরিবর্তনের আশায় আকাশের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করলেন-

“নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি তোমাকে সেই কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকেই মুখ কর”। (সূরা বাকারা- ২:১৪৪) এটি ছিল হিজরতের ১৬ মাস পরের এবং বদরের যুদ্ধের মাত্র দুই মাস পূর্বের ঘটনা।

কিবলা পরিবর্তনের এই ঘটনায় বড় বড় অনেকগুলো হিকমত রয়েছে এবং এটি ছিল মুসলিম, মুশরিক, ইহুদী এবং মুনাফিক সকল সম্প্রদায়ের জন্যই পরীক্ষা। মুসলিমদের তো কোন সমস্যাই ছিলনা। আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াত পাওয়ার কারণে তারা বললেন- আমরা ঈমান এনেছি, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। তাই আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। তাদের কাছে বিষয়টি তেমন বড় ছিলনা।

মুশরিকরা বলতে লাগল, সে যেমন আমাদের কিবলার (কাবার) দিকে ফেরত এসেছে তেমন অচিরেই আমাদের দ্বীনে ফেরত আসবে। আমাদের কিবলাকে সত্য মনে করেই সেদিকে ফিরে এসেছে। ইহুদীরা বলতে লাগল- সে তাঁর পূর্বের সকল নাবীদের কিবলার বিরোধীতা করছে।

মুনাফিকরা বলতে লাগল- জানিনা, এই লোক কোথায় যাচ্ছে? প্রথম কিবলা সঠিক হয়ে থাকলে সে একটি সত্য বিষয় পরিত্যাগ করেছে। আর দ্বিতীয়টি সঠিক হয়ে থাকলে প্রথমে সে বাতিলের উপর ছিল। এ ছাড়া মূর্খরা আরও অনেক কথাই বলেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন

“নিশ্চয়ই এটা (কিবলা পরিবর্তন) কঠিন বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন”। (সূরা বাকারা-২:১৪৩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হতে এটি মুমিন বান্দাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষাও ছিল। যাতে তিনি দেখে নেন কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিবলার বিষয়টি যেহেতু একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বলেছেন যে, কোন বিষয়কে মানসুখ (রহিত) করলে তার স্থলে আরও উত্তম হুকুম প্রদান করেন কিংবা অনুরূপ বিষয় স্থাপন করেন। এরপরই তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে ধমক দিয়েছেন, যারা রসূল সা :এর হুকুমের বিরুদ্ধে হঠকারিতা প্রদর্শন করে এবং তাঁর হুকুমের সামনে মাথা নত করেনা।

কিবলা পরিবর্তনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম তথা সকল দিক। সুতরাং তাঁর বান্দাগণ যেকোনো মুখ ফিরাবে আল্লাহ্ সেদিকেই রয়েছেন। তার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত। তিনি তাঁর বড়ত্ব ও বিশালতার মাধ্যমে সকল কিছুকে বেঁধে রাখেন রেখেছেন বলেই বান্দা যেকোনো মুখ ফিরাবে আল্লাহ্ তা‘আলা সেদিকেই রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা তাঁর অনুসরণ না করার কারণে এবং তাঁকে সত্যায়ন না করার কারণে জাহান্নামে যাবে তাদের সম্পর্কে তিনি তাঁর রসূলকে কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূলকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানরা কখনই তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেনা, যতক্ষণ না তিনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। তিনি এও বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে ইহুদী-খৃষ্টানদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে পরিত্রাণ দেয়ার পরও যদি তিনি তাদের অনুসরণ করেন তাহলে আল্লাহর মুকাবেলায় তাঁর

জন্য কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু থাকবেনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর আযাবের ভয় দেখিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা কাবার নির্মাণকারী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর আলোচনা করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। আরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁকে মানব জাতির ইমাম বানিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাবা ঘরের নির্মাণ সম্পর্কে এবং বিশেষ করে তাঁর খলীল ইবরাহীম (আঃ) এর নির্মাণ সম্পর্কেও বলেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) যেহেতু মুসলিম মিল্লাতের ইমাম তাই তাঁর হাতে নির্মিত ঘরও মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র এবং ইমাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- এই সম্মানিত ইমামের মিল্লাত থেকে কেবল মূর্খরাই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ইবরাহীম (আঃ) এর অনুসরণ করার ও তাঁর প্রতি এবং তাঁর পূর্বের সকল নাবীর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতিও ঈমান আনয়নের হুকুম দিয়েছেন। আর যারা ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর আহলে বাইতকে ইহুদী বা নাসারা বলে দাবী করে তাদের প্রতিবাদ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা উপরের সকল বিষয়কে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রসূল সা :যেখানেই থাকেন, যেখান থেকেই বের হন, সকল স্থানেই এবং সকল অবস্থাতেই তাঁকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের সন্ধান দেন। তিনিই তাদেরকে এই কিবলার দিকে হিদায়াত করেছেন। এটি মুসলিমদেরই কিবলা, তারাই এদিকে মুখ ফিরানোর হকদার। আর এটিই সর্বোত্তম কিবলা। মুসলিমগণ সর্বোত্তম জাতি। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্বাচন করেছেন সর্বোত্তম রসূল, তাদেরকে দান করেছেন সর্বোত্তম কিতাব, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম যুগে, বিশেষ করে তাদেরকে দান করেছেন সর্বোত্তম শরীয়ত, ভূষিত করেছেন তাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রে, পাঠিয়েছেন তাদেরকে সুন্দরতম ভূখন্ডে, অধিষ্ঠিত করেছেন তাদেরকে জান্নাতের সর্বোত্তম স্থানে এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে তাদের অবস্থানের জায়গা হবে সব চেয়ে উত্তম। তারা সে দিন দাঁড়াবে সুউচ্চ একটি টিলার উপর। অন্য লোকেরা দাঁড়াবে তাদের নীচে। সুতরাং আমি

ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহ অত্যন্ত বিশাল।

আল্লাহ্ তা‘আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলিম মিল্লাতের উপর তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করার এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যই কিবলাকে পরিবর্তন করেছেন এবং কাবাকেই তাদের কিবলা নির্ধারণ করেছেন।

পরিশেষে আল্লাহ্কে স্মরণ করার এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমেই নেয়ামত পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করলে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তা‘আলাও তাদেরকে স্মরণ করেন এবং ভালবাসেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে এমন বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, যা ব্যতীত তাদের নিয়ামাত পরিপূর্ণ হবে না। আর তা হচ্ছে সবুর ও সালাত। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

“নিশ্চিতই এটা (কিবলা পরিবর্তন) কঠিন বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন”। (সূরা বাকারা-২: ১৪৩)

ঈমানের প্রথম বিজয়

বদর যুদ্ধ:মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে একটি কূপের নাম বদর। এই কূপের নাম সেখানে একটি গ্রাম ও রয়েছে। তখনকার দিনে সেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির বেশ গুরুত্ব ছিল। এখানেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ হয়।

মদিনায় বইতে থাকা ইসলামি বসন্তের হওয়া কাফিরদের বেশ ভাবিয়ে তুলছিল।

তাই মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে তারা সর্বদা সচেষ্টি থাকত। মোটকথা তাদের গর্ব, অহংকার, এবং শক্তির উৎস ছিল শামে তাদের ব্যবসাবাগিজ্য। বিষয়টি মুসলিমরা ও আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে মুসলিমদের জন্য রাজনীতি ও কৌশল হিসেবে কুরাইশদের শক্তির এই উৎস বন্ধ করা জরুরি ছিল।

এ সময় অর্থসংগ্রহ ও যুদ্ধসরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার এক বিশাল বাণিজ্যকাফেলা শামে গিয়েছিল। কুরাইশদের এই বাণিজ্যকাফেলা যখন শাম থেকে ব্যবসা শেষে অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন নবীজী সাঃ এ সম্পর্কে জানতে পেরে দ্বিতীয়

হিজরীর ১২ রমজান ৩১৪ জন মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা সেখানে শিবির স্থাপন করেন। কেননা, মুসলিমবাহিনীর কাছে তখন আত্মরক্ষার্থে হামলা করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিষয়টি আবু সুফিয়ান টের পেয়ে রাস্তা ছেড়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যান। পাশাপাশি তিনি এক অশ্বারোহীকে দ্রুত মক্কার কুরাইশদের কাছে এটা জানাতে পাঠিয়ে দেন যে, কুরাইশরা যেন নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা শক্তি নিয়ে দ্রুত আসে এবং কাফেলাকে বিপদমুক্ত করে।

এদিকে কুরাইশরা আগে থেকেই মুসলিমদের মুলোৎপাটন করতে বিভিন্ন বাহানা খুঁজছিল। ফলে সংবাদটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৯৫০ জন সশস্ত্র যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হয়। তাদের সঙ্গে ১০০ ঘোড়া এবং ৭০০ উট ছিল। এ বাহিনীতে কুরাইশদের বড় বড় সকল নেতা অংশ নেয়।

গায়েবি সাহায্য : আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জন্য বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেভাবেই সবকিছু ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয়, ফলে বৃষ্টির পানিতে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সেনারা তখন তৃপ্তিভরে পানি পান করেন এবং নিজ নিজ পাত্রগুলোতে পানি ভরে রাখেন। অন্যদিকে এই বৃষ্টি কাফেরদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা যেখানে অবস্থান করছিল, সে জায়গায় বৃষ্টির পানিতে কাঁদা জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। হাঁটাচলা করা ও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে।

২য় হিজরীর ১৭ রমজান শুক্রবার উভয়পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধে शामिल হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক মাত্র ৩১৪জন, আর কুরাইশ মুশরিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। সংখ্যায় ও অস্ত্রে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে সহায়তা প্রদান করেন। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনদের সাহায্য করেন এবং তাদের মনোবল দৃঢ় করেন। যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতারা মুমিনদের পাশে থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন এবং মুসলমানদের অন্তরে বিজয়ের আশ্বাস সঞ্চার করেন। ফলে দুর্বল শক্তি নিয়ে উপস্থিত হলেও মুসলমানরা আল্লাহর এই গায়েবি সাহায্যের বরকতে বদরের ময়দানে এক ইতিহাসগড়া বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষা:বদর যুদ্ধের শিক্ষা মুসলমানদের জন্য চিরন্তন দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত। এই যুদ্ধে বিজয় শুধু সামরিক শক্তির ফল ছিল না, বরং ঈমান, তাকওয়া, ঐক্য এবং আল্লাহর উপর ভরসার প্রতিফলন। নিচে এর প্রধান শিক্ষাগুলো আলোচনা করা হলো—

১. ঈমান ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা:

বদরে মুসলমানরা সংখ্যায় ও শক্তিতে দুর্বল ছিল, কিন্তু তাদের দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর প্রতি আস্থা বিজয়ের পথে সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এটি শেখায় যে ঈমানই মানুষের প্রকৃত বল।

২. নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব:

রাসুল সা: সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও কৌশলগত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মুসলমানদের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করেন। যুদ্ধ বা যেকোনো লক্ষ্য অর্জনে সুশৃঙ্খল সংগঠন এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব অত্যন্ত জরুরি।

৩. ঐক্যের শক্তি:

মুসলমানরা একত্রিত হয়ে লড়াই করেছিল। জাতি বা গোত্রের বিভেদ ভুলে তারা এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একত্র হয়। ফলে বোঝা যায়—ঐক্যই বিজয়ের প্রধান চাবিকাঠি।

৪. আত্মত্যাগ ও ধৈর্য:

বদর যুদ্ধ মুমিনদের আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও ত্যাগের ইচ্ছা পরীক্ষা করে। এর মাধ্যমে শিক্ষা মেলে যে কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও আত্মত্যাগ করলে আল্লাহর সাহায্য আসে।

৫. ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো:

মুসলমানরা অত্যাচার, নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছিল। বদর শেখায়—ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসে।

৬. গায়েবি সাহায্যের শিক্ষা:

বদরে আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য পাঠান। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকা মানুষকে আল্লাহ এমন সাহায্য দেন যা মানুষের চোখে অদৃশ্য।

৭. পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির গুরুত্ব:

যদিও আল্লাহর সাহায্য ছিল, তবুও মুসলমানরা তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছিল। এটি শেখায় যে আল্লাহর উপর ভরসা করা মানেই চেষ্টা না করা নয়; বরং চেষ্টা ও তাওয়াক্কুল একসাথে চলতে হয়।

৮. জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে:

শেষ পর্যন্ত বিজয় আসে আল্লাহর ইচ্ছায়। তাই মানুষ তার দায়িত্ব পালন করবে, ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে।

উহ্দের ক্ষত এবং ধৈর্যের শিক্ষা: উহ্দের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষামূলক ঘটনা। সবার ঐক্যমতে উহ্দের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর শাওয়ালে সংঘটিত হয়। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, এর নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন: ৭, ৯, ১০ ও ১১ শাওয়াল।

বদরযুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার ফলে দুঃখের বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছিল। তারা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া এবং ৩ হাজার উট ছিল। এবং ১৪ জন মহিলাকে তারা এ জন্য সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল যে, এর তাদের পুরুষদের আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তুলবে এবং যারা পালাতে চায় তাদের তিরস্কার ও লজ্জা দেবে। ঐ দিকে নবীজী সাঃ ও ১০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসেন। মুনাফিকের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সমমনা ৩০০ মুনাফিক ও ছিল। তবে তারা পশ্চিমধ্যে বাহিনী ছেড়ে ফিরে আসে। ফলে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কমে ৭০০ জনে দাঁড়ায়।

এ যুদ্ধে সাহাবিদের আত্মত্যাগ ছিল ঈমান, আনুগত্য ও ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শুরুতে মুসলিম বাহিনী যখন বিজয়ের মুখে, তখনও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মানতে অটল ছিলেন। মহানবি সাঃ এর চারপাশে দাঁড়িয়ে বহু সাহাবি নিজেদের দেহকে ঢাল বানিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। হযরত তলহা (রা.) একাই অসংখ্য আঘাত সহ্য করে নবীজীকে রক্ষা করেন, আর আবু দুজানা (রা.) নিজের পিঠকে ঢাল করে শত্রুর তীরবৃষ্টি সহ্য করেন। হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) শাহাদতের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দেন। অনেক সাহাবি গুরুতর আহত অবস্থায়ও যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়েননি। তাদের এই আত্মোৎসর্গ ও একাগ্রতা প্রমাণ করে যে ইসলামের জন্য জীবন দেওয়াই ছিল

তাদের সর্বোচ্চ গর্ব। উহুদে সাহাবিদের ত্যাগ মুসলিম উম্মাহকে শেখায়—সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাকা, নবীজির প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করাই ঈমানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

কুরাইশদের প্রখ্যাত বীর আবদুল্লাহ ইবনু কুমাইয়া সেনাদের সারি ভেদ করে সামনে এগিয়ে যায়। এবং নবীজির চেহারা মুবারকে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ফলে নবীজির মাথায় পরিহিত শিরজ্ঞাণের দুটি কড়া মুখ ভেদ করে ঢুকে এবং একটি দাঁত শহীদ হয়।

ধৈর্যের শিক্ষা:

উহুদ যুদ্ধের ধৈর্যের শিক্ষা আমাদের সামনে যে অন্যতম বড় সত্যটি তুলে ধরে তা হলো—মুমিনের সফলতা সবসময়ই ধৈর্য, আল্লাহর উপর ভরসা এবং নবীজির নির্দেশের প্রতি অবিচল আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। উহুদের শুরুতে মুসলিমরা প্রায় বিজয় অর্জন করেছিল, কিন্তু তীরন্দাজদের অস্থিরতা ও মুহূর্তের ভুলে পরিস্থিতি বদলে যায়। ঠিক তখনই সাহাবিদের ধৈর্য, স্থিরতা ও আত্মসংযমের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয়। নবীজিকে রক্ষা করতে বহু সাহাবি প্রাণপণ লড়ে গেছে, কঠিন আঘাত সহ্য করেও যুদ্ধ ছেড়ে যায়নি। যুদ্ধের শেষে যখন কষ্ট, ক্ষতি ও শহীদদের জন্য গভীর শোক নেমে আসে, তখনো মুসলিমরা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি খুশি ও ধৈর্যের সাথে সমর্পিত ছিল। এই যুদ্ধ শেখায় যে কঠিন সময় আসবে, ভুলও হতে পারে—কিন্তু হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরলে, আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকলে এবং শুদ্ধ নিয়তে কাজ করলে শেষপর্যন্ত সফলতা মুমিনদের পক্ষেই ফিরে আসে। উহুদ তাই ধৈর্য, সতর্কতা, আনুগত্য ও ঈমানের দৃঢ়তার অনন্য পাঠশালা।

নীচের অনুচ্ছেদটি তোমার দেওয়া ছবির তথ্য অনুসারে খন্দক যুদ্ধ (গাজওয়ায়ে আহযাব) নিয়ে সাজানো হয়েছে—একেবারে পরিষ্কার, সহজ ও পরীক্ষায় লেখার মতোভাবে:

খন্দকের প্রাচীরে আকাশ ছোঁয়া ঈমান:

খন্দক যুদ্ধ বা গাজওয়ায়ে আহযাব ছিল মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশ ও তাদের মিত্র গোত্রসমূহের বিশাল এক সম্মিলিত হামলা। আল্লাহর নির্দেশে নবী করিম সা: মদিনাকে রক্ষা করার জন্য শহরের দুর্বল দিকটিতে প্রায় ৩ হাজার সাহাবীকে নিয়ে পরিখা (খন্দক) খননের সিদ্ধান্ত নেন। পারস্যের সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে পরিখা খনন শুরু হয় এবং সাহাবায়ে কিরাম দিন-রাত পরিশ্রম করে কঠিন শীতের মধ্যেও তা সম্পন্ন করেন। বিশ

হাজারেরও বেশি শত্রুসৈন্য যখন মদিনার দিকে অগ্রসর হয়, তখন পরিখা দেখে তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে, কারণ আরবের ইতিহাসে যুদ্ধের এমন কৌশল আগে কখনো দেখা যায়নি। শত্রুরা পরিখা অতিক্রম করতে না পেরে দীর্ঘদিন অবরোধ চালায়, কিন্তু মুসলমানদের ঐক্য, ধৈর্য এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের কারণে তারা কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। রসদ স্বল্পতার কারণে মুসলমানরা তিন দিন অনাহারে কাটান। সাহাবীরা এ সময় ক্ষুদায় অস্থির হয়ে নবীজিকে নিজেদের পেট উন্মুক্ত করে দেখান যে, সবাই পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তিনি তাঁর পবিত্র উদর খুলে দেখান যে, তাতে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে। দীর্ঘ ২৫ দিন পর অবশেষে প্রবল ঝড়ো বাতাস ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ভীতি শত্রুশিবিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তারা রাতের আঁধারেই পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ছিল ধৈর্য, পরামর্শ, কঠোর পরিশ্রম এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভরতার এক অনন্য শিক্ষা।

হুদাইবিয়ার সন্ধি: পরাজয়ে ঢাকা জয়

হিজরতের ষষ্ঠ বছরে জিলরুদ মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় দেড় হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উমরাহর উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা হন। তারা যুদ্ধ করতে আসেননি—বরং ইহরাম বেঁধে কোরবানির পশু সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের প্রবেশে বাধা দিতে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাদেরকে থামিয়ে দেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও রাসূল (সা.) ধৈর্যসহকারে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ অবলম্বন করতে চান। মুসলমানদের পক্ষ থেকে উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়, যদিও তাঁর সম্পর্কে পরে ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সাহাবীগণ রাসূল (সা.)-এর হাতে বায়আত—যাকে বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়—দিতে অঙ্গীকার করেন যে তাঁরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়বেন।

পরে কুরাইশের পক্ষ থেকে সাহল ইবন আমর আলোচনা করতে আসেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি সম্পন্ন হয়। পরে নিম্নোক্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করে অঙ্গীকারপত্র লেখা হয় এবং ১০ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয়:

- ১) মুসলিমরা এবার উমরা না করেই ফিরে যাবেন
- ২) আগামী বছর হজ করতে এসে মাত্র তিন দিন থেকে ফিরে যাবেন
- ৩) অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না। তরবারি সঙ্গে রাখা যাবে না, তবে তা কোষবদ্ধ থাকবে।
- ৪) মক্কা থেকে কোনো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না।
- ৫) কোনো মুসলমান যদি মক্কায় চলে আসতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

৬)যদি কেউ মদিনা চলে যায় ,তাহলে নবীজী তাকে ফেরত পাঠাবেন।

৭)মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে এলে কাফিররা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

এসব শর্ত বাহ্যত মুসলমানদের জন্য কষ্টকর মনে হলেও রাসূল (সা.) মহান দূরদর্শিতার সাথে চুক্তিটি মেনে নেন, কারণ তিনি রক্তপাত বন্ধ চাইতেন এবং ভবিষ্যতের বিশাল কল্যাণ দেখেছিলেন।

এই সন্ধির ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের যোগাযোগ বাড়ে, ইসলামের দাওয়াত নিরাপদভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম দ্রুত বিস্তৃত হয়। পরবর্তীতে কুরাইশরা নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করলে মুসলমানরা বিজয়ী শক্তি নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হয়, যা শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয়-এর পথ উন্মুক্ত করে। তাই হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক দূরদর্শী, শান্তিপূর্ণ ও কৌশলগত মাইলফলক।

কিছু উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ

খাইবারের যুদ্ধ:

খাইবার ছিল মদিনার উত্তরে অবস্থিত এক শক্তিশালী ইহুদি দুর্গসমূহের অঞ্চল, যেখানে বনু নাযিরের বিতাড়িত ইহুদিরা আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সংগঠিত করছিল। খন্দকের যুদ্ধের পর তারা কুরাইশসহ বিভিন্ন গোত্রকে উসকানি দিয়ে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করে। এ অবস্থায় নবী সা :মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৭ হিজরিতে খাইবার অভিযানে রওনা হন। খাইবার ছিল সুদৃঢ় দুর্গাবেষ্টিত; প্রতিটি দুর্গ আলাদা শক্তি ও যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দশ দিনের মাথায় আলীর নেতৃত্বে নাসিম দুর্গ জয় হয়। 'কামুস' দুর্গ, আল ওয়াতিহ এবং আস সুলালাম দখল করা কঠিন হয়ে পড়ে, মুসলমানরা বহুদিন অবরোধে থাকেন। পরে নবী সা: আলী (রা.)-কে যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করলে পরিস্থিতি বদলে যায়। আলী (রা.) অসাধারণ সাহস ও তেজ দেখিয়ে কামুস দুর্গ ভেদ করেন, ইহুদিদের প্রধান যোদ্ধা মারহাবকে পরাজিত করেন এবং মুসলমানদের বিজয়ের পথ খুলে দেন। ধীরে ধীরে সব দুর্গ মুসলমানদের হাতে চলে আসে।

এই বিজয়ের ফলে মদিনার বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের মূল কেন্দ্র ধ্বংস হয় এবং মুসলমানদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। খাইবারের উর্বর জমি

ও খেজুরবাগানের আয় নবী সা: চুক্তির ভিত্তিতে ইহুদিদের কাজ চালিয়ে যেতে দিয়ে রাষ্ট্রের আয় নিশ্চিত করেন। যুদ্ধটি প্রমাণ করে—নবী সা:-এর কৌশল, সাহস ও নেতৃত্ব মুসলিম রাষ্ট্রকে শুধু বাহ্যিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেনি, বরং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের মজবুত ভিতও তৈরি করেছে।

মুতার যুদ্ধ: এই যুদ্ধের কারণ ছিল, রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষ থেকে শামের বালকায় নিযুক্ত বসরার গভর্নর ছিল আমর ইবনু শুরাবিল। সে নবীজির দূত হারিস ইবনে উমায়ের রা: কে হত্যা করে। আর দূত হত্যা ছিল তখনকার রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। ফলে মুসলিমদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

নবীজী সা: যখন হারিস ইবনে উমায়েরের শহীদ হওয়ার সংবাদ পান, তখন জায়েদ ইবনে হরিসার নেতৃত্বে ৩ হাজার সেনার এক বাহিনী তার বিরুদ্ধে পাঠান। জায়েদের বাহিনী যখন মুতা অঞ্চলে পৌঁছায়, তখন রোমানরা এ সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে তারা দেড় লাখ সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে।

কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর আব্বাস তায়ালা দেড় লাখ কাফিরের বিশাল বাহিনীর অন্তরে মাত্র ৩ হাজার মুসলিমদের এমন ভীতি সঞ্চার করেন যে, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় তারা খুঁজে পায়নি।

হুনাইন যুদ্ধ:

হুনাইন যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। মক্কা বিজয়ের পর আরবের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে কিন্তু এর মধ্যে হওয়াজিন এবং সাকিফ গোত্র দুটি নিজেদের আত্মসম্মান বোধ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কার দিকে এগোয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের পর ইসলামে প্রবেশকারী হাজার হাজার নতুন মুসলমান নিয়ে হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁরা হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের আক্রমণ প্রতিরোধে অগ্রসর হন। কিন্তু অনেক সাহাবি সংখ্যার গর্বে কিছুটা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েন।

যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং কিছুটা বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েন। হাওয়াযিন বাহিনী পাহাড় থেকে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এতে মুসলিম বাহিনীর কিছু অংশ পিছু হটে

যায়। কিন্তু রাসুল (সা.) নিজে স্থির থেকে সাহসের সাথে তাদের আহ্বান জানান। সাহাবিরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ চালায় এবং আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের শিক্ষা ছিল—সংখ্যায় নয়, বরং ঈমান, একতা ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা দিয়েই প্রকৃত বিজয় আসে। বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয়; আর হুনাইনযুদ্ধে এত বিপুল সাজ সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পরাজয়ের এটাই সেই রহস্য। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী বড় একটি শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে ইসলামের শক্তি প্রতিষ্ঠা করে।

তায়েফ যুদ্ধ: তায়েফ ছিল বনু সাকিফ বনু হওয়াজিনের কেন্দ্র। প্রায় ১৮ দিন অবরুদ্ধ রাখার পর ও বিজয় অর্জিত হয় নি। ফলে অবরোধ তুলে ফেরার সময় জিইররানা নামক স্থানে যখন পৌঁছান, তখন তায়েফের হাওয়াজিনের একটি প্রতিনিধিদল নবীজির খেদমতে এসে আবেদন করে, হুনাইনযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে তাদের যে সকল লোক বন্দি রয়েছে, তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। নবীজী সাঃ তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করেন। এরপর তিনি যখন তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাবুক যুদ্ধ -

তাবুক যুদ্ধ ছিল ইসলামের সর্বশেষ বৃহৎ সামরিক অভিযান, যা ৯ হিজরি সালে সংঘটিত হয়। রোমানদের বিশাল সেনাবাহিনী মুসলমানদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে—এমন সংবাদ পেয়ে নবী সাঃ পূর্বাঞ্চলীয় সীমানা সুরক্ষার জন্য তাবুক অভিমুখে রওনা হন। এটি ছিল বছরের সবচেয়ে কঠিন সময়—প্রচণ্ড গরম, দীর্ঘ পথ, খাদ্য ও পানির স্বল্পতা—তবু নবী সাঃ সাহাবীদেরকে আল্লাহর পথে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের আহ্বান করলে সমগ্র মদিনা সাড়া দেয়। এই অভিযানে প্রায় ত্রিশ হাজার সাহাবী অংশ নেন; উসমান (রা.) অসংখ্য সম্পদ দান করে “জাইশুল উসরাহ্” বা কষ্টের সেনাদলকে শক্তিশালী করেন। তিনি যুদ্ধ তহবিলে বড় ধরনের সাহায্য করেন। তাতে ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া ছিল। আবু বকর রাঃ ঘরের সব জিনিসপত্র নবীজির খিদমতে পেশ করেন। নবীজী তাবুকে প্রায় ১৫-২০ দিন অবস্থান করেন। মুসলমানদের ঐক্য, ত্যাগ ও প্রস্তুতির দৃশ্য দেখে রোমানরা তাবুক অঞ্চলে এগোতেই সাহস পেল না, ফলে কোনও যুদ্ধ ছাড়াই নবী বিজয়ী অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসেন। এই

অভিযান মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভাবকে আরবের উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করে এবং প্রমাণ করে যে ইসলামের শক্তি শুধু অস্ত্রের জোরে নয়, বরং ঈমান, নেতৃত্ব ও ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

মক্কা বিজয়: ঘরে ফেরার মুহূর্ত এবং ক্ষমার মিছিল

মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও দয়া-দর্শনীয় এক মহান ঘটনা। হিজরতের পর কুরাইশরা বারবার মুসলমানদের সঙ্গে বেঈমানি করেছিল। এবং শেষমেশ ৮ম হিজরিতে কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসূল সাঃ একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে তখন কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন যে,এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদাইবিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে বলে মনে করতে হবে।ফলে কুরাইশরা সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে।অবস্থায় রাসূল সাঃ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দশ হাজার সাহাবির বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি মক্কার দিকে রওনা হন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাত নয়, বরং কুরাইশদের অহংকার ভেঙে তাদেরকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা।মক্কার চারদিকে মুসলিমদের চারটি বাহিনী এমনভাবে অবস্থান নিলো যে,প্রতিরোধ গড়ার মতো কোনো অবস্থাই কুরাইশদের ছিল না। তারা একেবারে হাল ছেড়ে দিল। বিনা বাধায় মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করতে লাগলো।শুধুমাত্র খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. যদিকে অবস্থান নিয়েছিলেন সেদিকে বনু বকর ও হুদাইল বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে।কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদ তাদের পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দেন।অল্পসময়েই তারা কোনরকম পালিয়ে বাঁচে।এটাই ছিল মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে একমাত্র নামে মাত্র প্রতিরোধ।মক্কায় প্রবেশের পর কুরাইশদের অনেকেই ভীত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু রাসূল সাঃ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন—বলা হলো”কেউ যদি তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ ‘যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে সে ও নিরাপদ।“আজ তোমাদের ওপর কোনো প্রতিশোধ নেই।” তিনি সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং মক্কাতে শান্তিপূর্ণভাবে দখল করেন। এরপর তিনি কাবাঘরের মূর্তিগুলো অপসারণ করে তাওহিদের আলোক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লাহর রাসূল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন যেন কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় সম্ভব হয়।সেটাই হয়েছিল।

যে মানুষটি আজ থেকে আট বছর আগে এই শহর ছেড়ে রাতের আধাঁরে চুপিসারে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন,তিনি আজ ফিরে এসেছেন।ফিরে এসেছেন সেই আজীবন পরিচিত জন্মভূমির মাটিতে।যে মানুষগুলো তাঁকে লাঞ্চিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা আজ ভক্তি

শ্রদ্ধাভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে!এভাবেই মক্কা বিজয় রক্তপাতহীন, ক্ষমাশীলতা ও সত্য প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাসে স্থান পায়।

বিদায় হজ্জ:রাসূলুল্লাহ সাঃ হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন।এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ।সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে দেখার ও শোনার সুযোগ পায়।মদিনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ উট চড়ে হজ করেছিলেন। তাঁর এই হজে কোনো বিলাসিতা ছিল না।নিতান্তই সাধাসিধে ভাবে তিনি এই হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন।

এরপর যখন তিনি আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন “ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” (সূরা মায়িদা,৫:৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীরা কাঁদতে শুরু করলেন।তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না।

৯ জিলহজ রাসূল সাঃ আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে উপস্থিত হন এবং অত্যন্ত নাতিদীর্ঘ ও সাহিত্যলংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন, যে ভাষণ মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের নীতিমালা ও উপদেশ ভরপুর ছিল।এটাই ছিল নবীজির শেষ ভাষণ।কিছু অংশ তুলে ধরা হলো,

নবীজী বলেন,

লোকসকল ,আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো,যাতে আমি তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় বর্ণনা করতে পারি।আমি জানি না।আগামী বছর আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব কিনা।

নবীজী আরও বলেন,

মুসলিমদের জানমাল,ইজ্জত - সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত এমনভাবে পবিত্র ও সম্মানিত ,যেভাবে আজকের এ দিন(আরাফাতের দিন),এ মাস (জিলহজ মাস)এবং এ শহর (পবিত্র মক্কা)তোমাদের কাছে পবিত্র ও সম্মানিত।এ জন্য কার ও কাছে যদি অন্য কারো আমানত থেকে থাকে,তাহলে অবশ্যই সেটা আদায় করতে হবে।

তিনি আরও বলেন,

হে লোকেরা,তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে,যেভাবে স্ত্রীদের উপর তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে।সকল মুসলমান এক অপরের ভাই । কারও জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নেওয়া বৈধ নয়।

আমার পরে তোমরা আবারও কাফির হয়ে যেয়ো না। একে অপরের হত্যা করো না।আমার অবর্তমানে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে যাচ্ছি।তোমরা যদি কুরআনের যাবতীয় বিধান শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো,তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।

নবীজী আরও বলেন,হে লোকসকল,তোমাদের রব একজন ,তোমাদের আদি পিতা একজন,তোমরা সবাই আদম আ. এর সন্তান,আর আদম আ.মাটির সৃষ্টি । তোমাদের সেই সবচেয়ে অধিক সম্মানী,যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। কোনো আরব খোদা ভীতি ছাড়া কোনো অনারবের উপর শ্রেষ্ঠ হতে পারেনা।

স্মরণ রেখো,আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি।আমি শেষ নবী ,আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।হে আল্লাহ ,আপনি সাক্ষ্য থাকুন,আমি তাদের কাছে আপনার বাণী পৌঁছে দিয়েছি।

তোমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত , তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অনুপস্থিতদের মধ্যে এসব কথা পৌঁছে দেওয়া।

হজ শেষে রাসূল সাঃ আরও ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন।এরপর মদিনায় ফিরে আসেন।

নবীজির ইন্তেকাল:অনন্তের পথে যাত্রা

“তুমি নেই নবী এ কথা যখন আমার মননে জাগে

ঝরে পড়ে যায় বেদনার ফুল হৃদয়ের গুলবাগে”

দিনটি ছিল সোমবার।আল্লাহর রাসূল সাঃ সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান।কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর রা. মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন , রাসূল স

সাঃ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন।তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে।তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন।সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ।মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে।রাসূলুল্লাহর মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তিনি মুচকি হাসলেন।রাসূলুল্লাহর হাসিমুখ দেখে সাহাবীরা ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম।আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায়,

“আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।”

আবু বকর রা.রাসূলুল্লাহকে ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে ফিরে আসছিলেন,কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই সালাত আদায় করে নেন।এরপর রাসূলুল্লাহ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত।এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর শেষ সালাহ। আইশা (রা:)এর ভাই আব্দুর রহমান তাদের ঘরে এলেন,তার হাতে একটি মিসওয়াক ছিল।রাসূলুল্লাহ সেই মিসওয়াক এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।আয়েশা রা: তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন।তিনি জিজ্ঞেস করলেন,আপনি কি এটা চান?রাসূলুল্লাহ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই।আয়েশা রা: তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রসূলুল্লাহকে এগিয়ে দিলেন।জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রসূলুল্লাহ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর কষ্ট বাড়তেই থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন, ‘ বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে! সেই কষ্টের মুহূর্তে ও নবীজী তাঁর মেয়ের কথার উত্তর দিলেন, ‘ আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা’ ।

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রসূল সা: শুয়ে ছিলেন আয়েশা রা: এর কোলে মাথা রেখে।পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন,আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।রাসূলুল্লাহ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির সেরা , তাঁকে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল।

শেষ সময় ঘনিয়ে এল।রাসূলুল্লাহ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,বলছিলেন,

‘ হে আল্লাহ !আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী,সিদ্দিক,শহীদ এবং সৎ ব্যক্তিদের সাথে,যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।

হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করে দাও!আমার উপর রহম করো !আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো!

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল সাঃ তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,

ফীর - রফিকুল আ' লা !

ফীর - রফিকুল আ' লা !

ফীর - রফিকুল আ' লা !

রাসূলুল্লাহর চোখের পাতা ভারী হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাঃ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালায় কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে ও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা - ওয়ালহিক্বনী বির রফিকুল আ ' লা - । আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার উপর ছায় হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বকের মাঝে আগলে রাখা মানুষকে। ভয়ে কষ্টে বিপদে দ্বন্দ্বে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত। যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবীজির কবর আয়েশা রাঃ ঘরের সে স্থানটিতে খনন করা হয়, যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। আবু তালহা রা. নবীজির কবর খনন করেন। এবং আলী ও আব্বাস প্রমুখ নবীজির লাশ মুবারক কবরে রাখেন। কবরটি এক বিঘত পরিমাণ উঁচু রাখা হয়।